জীবনের সহজ পাঠ

রেহনুমা বিনত আনিস

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

বিষয়সূচী

শারঈ সম্পাদকের কথা ৮
অদ্ভুত! ৯
দুই মেরু ১২
উই লাভ মুহাম্মাদ ﷺ ১৯
আযান ২৩
বৈচিত্র্যময় ৩০
হৃৎস্পন্দন ৩৬
জীবনের সহজ পাঠ ৩৯
সম্পদ ও সম্পর্ক ৪৪
একতলা দোতলা ৪৯
আমি কিপটা ৫৩
সুবিচার ৫৭
তুলনায় সুখ অসুখ ৬২
আমরা মানুষ হতে চাই, না যন্ত্র? ৬৬
ধোঁকা ৭১
কথাটি কি দয়ার্দ্র? ৭৪
অল্প বিনিয়োগে অধিক মুনাফা ৭৮
দুষ্ট বন্ধুর দুষ্টুমি ৮২
সৎ এবং সাহসী মানুষ ৮৯
নওমুসলিম... তারপর? ৯৪
একানব্বইয়ে যা দেখেছি ৯৯
ভূমিকম্প ১০৬
অক্টোবরের পালাবদল ১১০
জাররা জাররা ১১৫
জাহান্নামের মানসিক শাস্তি ১১৯
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে ১২৭

শার‘ঈ সম্পাদকের কথা

জীবন আমাদের সামনে প্রতিনিয়ত হাজির হয় বিপুল পরিমাণ উপদেশ নিয়ে। সেগুলো আমরা খুব কমই কুড়িয়ে নেই। আমাদের সামনে হরহামেশা ঘটে চলা ঘটনাবলী আর ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা দৃশ্যাবলী ভাবনার জগতে খুব কমই আলোড়ন তোলে।

এই গড়পড়তার ভেতরেও কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ থাকেন, যারা জীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো ভাবতে ভালোবাসেন। সেই ভাবনা থেকে ভালো কিছু তুলেও আনতে পারেন। তেমনই একজন লেখিকা হলেন রেহনুমা বিনতে আনিস। আর তেমনই কিছু ভাবনা আর বোধের ফসল হলো *জীবনের সহজ পাঠ* নামক এই বইটি।

আল্লাহ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া যে, তিনি আমাকে বইটির শারঈ সম্পাদনা করার তাওফীক দান করেছেন। সম্পাদনাকালে আমি যে কাজগুলো করেছি সেগুলো হলো, বইটিতে উল্লেখিত হাদীসগুলো যাচাই ও উৎসমূল নির্দেশ, আয়াতসমূহের অর্থ যাচাই, কিছু ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা বিয়োজন, সঠিক বর্ণনা সংযোজন, আপত্তির অবকাশ থাকে এমন কিছু বাক্যের সংশোধন ইত্যাদি।

বইটি পড়েছি আর জীবনবোধ কীভাবে মানুষকে গভীর থেকে গভীরে নিয়ে ভাবতে শেখায় তার পরিচয় পেয়েছি। আপত নজরে যেটা খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা সেটাকেও বোধ ও ভাবনার সহায়তায় লেখিকা এমনভাবে উপদেশযোগ্য করে ফুটিয়ে তুলেছেন যা সত্যিই তার পারঙ্গমতার সাক্ষ্য বহন করে।

বইটি তার নামের মান বজায় রেখে পাঠকের সামনে জীবনের সহজ পাঠ সহজভাবে তুলে ধরবে এটা আমার বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। লেখিকাসহ আরও যারা বইটি ছাপার অক্ষরে আসার পেছনে সচেষ্ট ছিলেন তাদেরকেও কবুল করুন। বিশেষকরে রোকন ভাই ও ইসমাঈল ভাইকে আল্লাহ তাআলা তাদের আন্তরিকতার পরিপূর্ণ প্রতিদান দিন। আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
১২-০৫-১৪৩৯ হি.
২৯-০১-২০১৮ খ্রি.

অদ্ভুত!

রাস্তায় বেরোলেই আমার প্রাত্যহিক দুআগুলো সেরে নিতে খুব ভালো লাগে। প্রথমত, সময়টা কাজে লাগানো হয়। দ্বিতীয়ত, ভ্রমণকালীন দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। সেদিন এক বান্ধবীর বাসায় যেতে যেতে কালেমা পড়ছিলাম, ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু’। ইদানীং আমরা বান্ধবীরা চেষ্টা করছি তোতাপাখির মতো গড়গড় করে নামাজ বা দুআ না পড়ে কী পড়ছি বুঝে পড়ার। তাই মুখে বলতে বলতে মনে মনে অনুবাদ করছি, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর দাস এবং বার্তাবাহক’।

পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার মাথায় এল, এখানে মূল কথা একটাই। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, এই কথাটার স্বীকৃতি। সম্পূর্ণ কুরআনেরও মূল বক্তব্য এটাই। আর এই নিয়ে দুনিয়ার যত সমস্যা! কথাটা চিন্তা করে আমার খুব হাসি পেল। এটা একটা সমস্যা হওয়ার মতো ব্যাপার? আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে কবিতাটিকে তাঁর কবিতা আর রবীন্দ্রনাথকে কবি বলে স্বীকৃতি দিই, তাতে কি কোনো ভুল হয়ে যায়? তাহলে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে এত ঝামেলার কী আছে? অথচ এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে মানুষের যে কত সমস্যা!

সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার জন্য মানুষ বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হয়। অথচ বিজ্ঞান হলো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টবস্তু নিয়ে গবেষণার অসম্পূর্ণ ফলাফল। বিজ্ঞানীরা সৃষ্টবস্তুর

ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। অথচ এতেই তাদের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না! কিন্তু যিনি সবকিছু সৃষ্টি করলেন শূন্য থেকে, তাঁকে অস্বীকার করে তারা নিজেদের ‘গড’ বানাতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন!

একজন মানুষ যখন আমাদের এক গ্লাস পানি ঢেলে দেয়, তখন তাকে মিষ্টি করে ‘ধন্যবাদ’ না বললে সে রাগ করে; যদিও পানি বা পানির গ্লাস কোনোটাই তার বানানো নয়। অথচ যিনি আমাদের এই প্রাণ, এই শরীর, পরিবার, লেখাপড়া, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক, খাবার-দাবার, এই সুন্দর পৃথিবীময় নিশ্বাসের বাতাসটা পর্যন্ত দিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ বলতে আমাদের মানসম্মান সব শেষ হয়ে যায়!

এক বছরের মধ্যে ছয় মাস ফাঁকি দিয়ে যে শিক্ষক পড়ান, তিনি আমাদের পরীক্ষা নিলে আমরা বিরক্ত হই না; বরং আশা এবং ভয় নিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করি। অথচ যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করলেন, তাঁর কাছে কেন জবাবদিহি করতে হবে, ফলাফল পেতে হবে তা-ই নিয়ে আমাদের নালিশের শেষ নেই! আল্লাহ যতক্ষণ দেন ততক্ষণ আমরা একটা ‘থ্যাংক ইউ’ বলারও প্রয়োজন মনে করি না। কিন্তু তিনি কেবল একটা কিছু না দিলে বা নিয়ে নিলেই আমরা আক্রোশে ফেটে পড়ি, ‘আল্লাহ আমার প্রতি অন্যায় করেছেন, তাই তাঁকে মানার কোনো প্রয়োজন নেই’।

ভাবছিলাম আমাদের কথা। আজকে যে সারা বিশ্ব মুসলিমদের ওপর হামলে পড়েছে, সবাই মানুষ অথচ আমাদের কেউ মানুষ বলে মনেই করছে না। তাদের সাথে কিন্তু আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই—আমরা সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছি, এটা ছাড়া। শুধু এই কারণেই আমাদের পরিবারের আধুনিকতাবাদীরা আমাদের ব্যাকওয়ার্ড মনে করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। সমাজের নানান স্তরের লোকজন আমাদের নিয়ে খুব চিন্তিত, আমাদের নিয়ে দেশের উন্নতি কীভাবে হবে? অথচ আমরা কারও পাকা ধানে মই দিইনি বা বাড়া ভাতে ছাই দিইনি; যেহেতু সৃষ্টিকর্তা বলেছেন আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাহলে আমাদের অপরাধ কী? আমরা কেন সৃষ্টিকর্তাকে ও তাঁর দ্বীনকে স্বীকার করলাম, এটাই? এরজন্যই আমাদের পৃথিবীব্যাপী গালি দেয়া, মেরে ফেলা, খারাপ মনে করা জায়েজ হয়ে গেল?!

আমার দ্বিতীয় সন্তান যখন আমার ভেতরে, আমার ভীষণ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলো।

আমি এতে অভ্যস্ত ছিলাম না, তাই খুব কষ্ট হোতো। মনে হতো আল্লাহর এই পৃথিবীতে এত বাতাস, অথচ আমার ছোট্ট দুটো ফুসফুস কিছুতেই বাতাসে পূর্ণ হচ্ছে না! একদিনের কথা খুব মনে পড়ে। দুপুর দুটার সময় যে শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, রাত দশটা পর্যন্ত আটটি ঘণ্টা আমার দুই ননদ পালা করে আমার পিঠে হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। পিঠে চেপে ধরলে কিছুটা শ্বাস নিতে পারি, হাত সরালেই দম বন্ধ হয়ে যায়। মনে হলো, এই যে আমরা শক্তি, সাহস আর বীরত্বের বড়াই করি; অথচ সামান্য একটু বাতাস বুকের ভেতর টেনে নিতে পারি না আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া! এভাবে একদিন শেষ নিশ্বাসটাও আমাদের দেহ ছেড়ে চলে যাবে, আর ফিরে আসবে না। তাহলে কীসের আমাদের এত অহংকার? কী ভেবে আমরা তাঁকে অস্বীকার করি, যাকে ছাড়া এক ফুসফুস বাতাস আমাদের দেহে প্রবেশ করে না সকল চেষ্টা সত্ত্বেও?

একদিন আমার ক্লাস নেয়া শেষে হাফিজ সাহেব আমাকে আনতে গিয়েছেন ইউনিভার্সিটি থেকে। সেদিন শুক্রবার। রাস্তাঘাট ফাঁকা। তাই আমার দ্বিতীয় সন্তান রিহামকে নিয়ে গিয়েছেন। ওর বয়স তখন দেড় বছর হবে। মাত্র হাঁটতে আর কথা বলতে শিখেছে। স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এসে একপাল গরু দেখে ওর যে কী হলো, চলন্ত মটরসাইকেলে আমার কোল থেকে নেমে খালি পায়ে সে গরুগুলোর পিছু ধাওয়া করতে লাগল! আমি দৌড়ে গিয়ে ধরার আগেই সে চলে গিয়েছে বহুদূর। কিন্তু গরু দেখা শেষে ওকে সেই আমার কাছেই ফিরে আসতে হলো।

এভাবে আমরা যতদূরই চলে যাই না কেন, শেষপর্যন্ত ফিরে আসতে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছেই। তাই এই ব্যাপারে দ্বিমত করে সময় নষ্ট করার বোকামি মানুষ কেন করে, তা আজও বুঝলাম না! কী জানি? হয়তো যারা এই দ্বিমতের ওপর ভিত্তি করে আমাদের হত্যা করে ফেলাও কোনো অন্যায় মনে করেন না, তাদের নিশ্চয়ই খুব ভালো কোনো যুক্তি আছে!

দুই মেরু

শরীফ আবু হায়াত অপুর স্ট্যাটাস থেকে উদ্ধৃত : ‘কেউ যদি আমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আমিও তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। কেউ যদি আমাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, আমি তাকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি। কেউ যদি আমাকে ব্যক্তিগত কারণে ঘৃণা করে, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যেন তিনি সেই ঘৃণার ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করেন। কেউ যদি সেই ঘৃণা থেকে আমাকে কষ্ট দেয়, তবে আমি আল্লাহর কাছে দুআ চাই, যেন তিনি সেই কষ্টের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করে দেন। তবে কেউ যদি ইসলামকে সহ্য না করতে পেরে আমাকে ঘৃণা করে, তাহলে আমি তাকে ঘৃণা করি ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সে ইসলামকে ভালোবাসতে না পারে।’

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম সমাজকে দুটো মোটা দাগে বিভক্ত করলে দেখা যায়, একটি ভাগ এমন যে, তারা দাবি করেন, তাদের মনে বিশ্বাস আছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক থেকে কাজকর্ম কোনো কিছুতেই এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। আরেকদিকে একদল আল্লাহর বান্দা কিছু set of rules নিয়ে এত ব্যস্ত যে, মাঝখানে পড়ে ইসলামের মূল স্পিরিটটাই হারিয়ে যায়। মধ্যখানে চাপের মধ্যে আছে সেসব মুসলিম, যারা ইসলামকে intellectually, spiritually এবং একটি জীবনাদর্শ হিসেবে ধারণ করতে চায়। এরা প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় প্রকার মুসলিম দ্বারা উপেক্ষিত এবং নিপীড়িত। প্রথম প্রকার মুসলিমরা মনে করে এরা backward এবং uncultured, সুতরাং এদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করা যায়। তারা প্রতিবাদ করতে গেলে তাদের বুঝিয়ে দেয়া হয়, যেহেতু তারা মুসলিম এবং ইসলাম শান্তির ধর্ম, তাদের সবকিছু

চুপচাপ মেনে নেয়া উচিত, এতেই শান্তি নিহিত। দ্বিতীয় প্রকার মুসলিম superiority complex এর রোগী। এরা নিজেদের এত উচ্চমানের আলেম এবং আমেল মনে করেন যে, ইসলামের সমতা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী তারা নিজেদের জন্য প্রযোজ্য মনে করেন না।

দ্বিতীয় প্রকারের মুসলিমদের রোগের পথ্যটা সহজতর, যেহেতু ফিতনার রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ঈমানের শ্বেতকণিকা তাঁদের শরীরে আগে থেকেই বিদ্যমান। হিদায়াহ নামক ভিটামিনের স্পর্শ পেলেই এগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তাই আগে ওটাই আলাপ করি।

> আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে বেশি কড়াকড়ি করে, তাকে দ্বীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়। কাজেই তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং কাছাকাছি হও। আর হাসিমুখ নিয়ে থাকো। আর সকাল-বিকাল ও রাতের কিছু অংশ (ইবাদাতের মাধ্যমে) সাহায্য প্রার্থনা করো।'[১]

ইসলামের নিয়মাবলির মূল উদ্দেশ্য ঈমানের সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তোলা। এর মাধ্যমে সমাজে একটি সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখা এবং অসুন্দরকে প্রতিহত করা। এটি একটি means বটে, তবে অভিষ্ট লক্ষ্য নয়।

আমাদের এই দ্বীনি ভাইবোনদের সমস্যা হলো তাঁরা সবকিছু সাদা-কালোতে বিভাজন করে ফেলার চেষ্টা করেন, প্রতিটি অণু-পরমাণু হিসেব করেন। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যাপারগুলোই এই দুই সীমারেখার মধ্যখানে ধূসর অংশে পড়ে। তাঁদের penny হিসেব করতে গিয়ে pound চলে যায়। তাই তো আল্লাহ আমাদের পথ চলার জন্য জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং চিন্তাশীলতার মতো অসাধারণ কিছু পাথেয় দিয়েছেন। যেন আমরা ধূসর এলাকাগুলো এই আলোয় navigate করতে পারি। যেন তিল পরিমাণ কাজ করে তাল পরিমাণ ফলাফল অর্জন করার উপায় অনুসন্ধান করতে পারি। অল্প পুঁজিতে অধিক মুনাফার ব্যবস্থা নিতে পারি। এই পাথেয়গুলো শিকেয় তুলে রেখে অপরের দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু set of rules অনুসরণ করে জীবনটা কাটিয়ে দেয়া গেলে কিঞ্চিৎ আরাম হয় বটে, কিন্তু ঝুঁকিটাও কিছু কম নয়। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে, আল্লাহপ্রদত্ত সকল instruments and weapons ব্যবহার করে অসাধারণ

---

[১] *বুখারি*, হাদীস নং : ৩৯।

একটি ফলাফল করার উদ্দেশ্যটা সফল হয় না। সুতরাং, আমরা কেবল ‘আমি কী নিয়মাবলি পালন করলাম’, ‘আরেকজন কোথায় একটু কম পড়ে গেল’, এ-জাতীয় বিবেচনা মাথায় না রেখে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যটিকে দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি। এতে ঐক্য, পারস্পরিক সম্মানবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার ভিত্তিতে একটি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এ তো গেল দ্বিতীয় প্রকার মুসলিমের কথা। প্রথম প্রকারের রোগ আরও ভয়াবহ। কারণ, তারা জানেই না যে তাদের দেহে ঈমানের শ্বেতকণিকার অভাব। তাই তারা নিজের ইচ্ছামাফিক নানাবিধ কাজ করে দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে, যে, তাদের বিশ্বাস থাকার দরুন, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন। জান্নাত কেবল তাদের জন্যই নির্মিত হয়েছে! যেসব backward এবং uncultured মুসলিম এদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে (ওদের দৃষ্টিতে backward এবং uncultured হবার জন্য সময়মতো নামাজ পড়া এবং মাথায় কোনোপ্রকার আচ্ছাদন ব্যবহার করাই যথেষ্ট), তাদের প্রতি এদের আচরণ অসম্মানজনক। কিন্তু তাদের প্রতিবাদ করতে গেলে তারা বিজ্ঞ ভঙ্গিতে বলে, ‘তুমি মুসলিম, তাই সমস্ত অন্যায়-অবিচার তোমার নীরবে মেনে নেয়া উচিত’। এদের মতো লোকদের সামনে প্রশ্ন, ‘তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা জানো না?’

তারা শুধু খাব্বাব, খুবাইব, বিলাল, আম্মার আর সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দৃষ্টান্ত দেখেন। অথচ এই মহান সাহাবিরা সবাই ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁরা খুশি হয়ে নয়, বরং নিরুপায় হয়ে অত্যাচার সহ্য করেছেন। তাঁরা আল্লাহর কাছে নিজেদের অভিযোগ জমা দিয়েছেন বারংবার। যখন উপায় আসে তখন তাঁরা এক মুহূর্তের জন্য বসে থাকেননি। খুবাইব رضي الله عنه কে যখন জনসমক্ষে শুলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়, তখন তিনি উপস্থিত খুনি ও নিষ্ক্রিয় দর্শকদের লানত দিয়ে যান, ‘হে আল্লাহ, তাদের সংখ্যা তুমি গুণে রাখো, তাদের তুমি এক এক করে হত্যা কোরো এবং কাউকে তুমি ছেড়ে দিয়ো না’। খাব্বাব رضي الله عنه ওহুদের ময়দানে তাঁর প্রাক্তন অত্যাচারী সিবাকে হামজা رضي الله عنه-এর হাতে নিহত হবার দৃশ্য শুকরিয়ার সাথে উপভোগ করেন।

আর যারা স্বাধীন ছিলেন? মুসআব رضي الله عنه কে তাঁর মা প্রাচুর্যের মাঝে লালনপালন করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁর মা তাঁকে ইসলাম পালনে বাধা দেয়ার

জন্য বন্দী করেন। তিনি পালিয়ে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর মা আবার তাঁকে বন্দী করতে চাইলে তিনি মাকে বলেন, ‘যদি তুমি এমনটি করো এবং যারা তোমার এ কাজে সাহায্য করবে, তোমাদের সবাইকে আমি হত্যা করব’। বদরের ময়দানে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ رضي الله عنه এবং তাঁর বাবা ছিলেন প্রতিপক্ষ। তিনি মুসলিম, তাঁর বাবা কাফির। প্রতিবার তাঁর বাবা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়, বার বার তিনি এড়িয়ে যান। তাঁর পরও যখন তাঁর বাবা তাঁর সম্মুখীন হতে থাকল, তখন তিনি তরবারির এক আঘাতে তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং আল্লাহ সমর্থন এবং প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন,

> ‘যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।’[২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বয়ং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এমন আরও শত শত উদাহরণ রয়েছে।

> আল্লাহ বলেছেন, ‘অবশ্যই যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয়ই তা দৃঢ়সংকল্পের কাজ।’[৩]

এর মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছেন এই দুটি মহিমান্বিত বৈশিষ্ট্য অর্জন করা মুমিনের জন্য কতখানি কঠিন কাজ এবং তিনি তা কতখানি appreciate করেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মুমিনকে জুলুম সহ্য করার কথা কোথাও বলেননি। বরং জানিয়েছেন যেখানেই জুলুম হবে, সেখানেই প্রতিবাদ করা মুমিনের নৈতিক দায়িত্ব—সে হোক নিজের প্রতি বা অপরের প্রতি। আমরা যে ভদ্রতার খাতিরে সামনে কিছু না বলে পেছনে গীবত করার hypocrisy করি, তা আমাদের সাবেক প্রভু ব্রিটিশদের দান, যা ব্রিটিশরা চলে যাবার এক শ বছর পরেও আমরা সযত্নে লালন করে চলেছি। কিন্তু মুমিন প্রতিবাদ করে সামনাসামনি।

---

[২] সূরা মুজাদিলা, ৫৮ : ২২

[৩] সূরা শুআরা, ২৬ : ৪৩

ঠিক ডিগ্রিধারী ইজিপ্টোলজিস্ট না হলেও, ছোটবেলা থেকে প্রচণ্ড আগ্রহ এবং এ বিষয়ে বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটির ফলে আমি প্রাচীন মিসরের ওপর মোটামুটি একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। আল্লাহ বলেছেন,

> ‘ফিরআউন, সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।’[৪]

কী বিশাল একখানা সার্টিফিকেট! একসময় কুরআন এবং প্রাচীন মিসরের তথ্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করলে আশ্চর্য লাগত, কেন সে আল্লাহকে সত্য জেনেও তাঁর সমস্ত নিয়ামতের জন্য একখানা লম্বা ‘থ্যাংক ইউ’ না দিয়ে নিজেকে ‘গড’ প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লাগল। সেদিন জবাবটা হঠাৎ মাথায় খেলে গেল। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে ‘সাবাশ’ বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। আমাদের আশেপাশেই সাধারণ চাপরাসি, কেরানি থেকে শুরু করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ধনী লোকেরা—কোনোক্রমে একখানা টেবিল-চেয়ার, একটা পজিশন, একটু ক্ষমতা বা খানিক টাকাপয়সা হলেই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। গর্বে অহংকারে তাদের মাটিতে পা পড়ে না, তাই চলাফেরা করে লোকের ঘাড়ের ওপর দিয়ে। আর ফিরআউন কে ছিল? সে ছিল বংশানুক্রমিক রাজা! এককভাবে তৎকালীন সুপারপাওয়ারের কেন্দ্রবিন্দু, বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তার রাজ্য ছিল ভৌগোলিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে সুরক্ষিত। তার সম্পদের অন্ত ছিল না, নামধারী সব পণ্ডিত তার অঙ্গুলিহেলনে নাচত। সে একদিকে বিশাল সব প্রাসাদ আর অন্যদিকে বিরাট সব মন্দির আর মূর্তি বানিয়ে ক্ষমতা ও দম্ভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। এর মধ্যে কিনা তার পালিতপুত্র এসে বলে, তিনি নবুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন! তাও কিনা তিনি বনী ইসরাঈলের লোক, যাদের সে শত শত বছর ধরে বংশানুক্রমে দাস বানিয়ে রেখেছে! আমাদের পুঁচকে পুঁচকে অহংকারেই আমরা বাঁচি না, তার এত্ত বড় অহংকারে এমন আঘাত কি সহ্য করার মতো কথা? কার মাথা ঠিক থাকে এই অবস্থায়? তাই একদিক থেকে বেচারার জন্য করুণাই হলো। আমাদের চারপাশে এমন অনেকেই ঘোরাফেরা করে, যারা ফিরআউনের মতো সুযোগ এবং ক্ষমতা পেলে তাকে শিশুতুল্য প্রমাণ করে ছেড়ে দিতে পারত।

অপরপ্রান্তে রয়েছেন সুলাইমান عليه السلام, কী দেননি আল্লাহ তাঁকে? রাজত্ব, ক্ষমতা, বুদ্ধি, মেধা, নবুওয়ত, বিচক্ষণতা, ন্যায়বিচার, এমন জাতির ওপর

---

[৪] সূরা দুখান, ৪৪ : ৩১

আধিপত্য যা এর আগে বা পরে আর কারও ছিল না এবং হবেও না। পশুপাখিদের ভাষা বোঝার ক্ষমতা এবং তাদের ওপর আধিপত্য। সে যুগেই আল্লাহ্ তাকে ঘোড়ার পরিবর্তে উড়ন্ত সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন সুদৃশ্য নগরী—যার মাঝে শোভা বর্ধন করত জিনদের তৈরি প্রথম এবং শেষ স্থাপত্য। কিন্তু ঈমান মানুষকে উপচে পড়া কৃতজ্ঞতায় ফলভারে নুয়ে পড়া গাছের মতো নত করে দেয়। তাই তিনি অহংকার তো দূরে থাক, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি এত মনযোগী ছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর দুআ কুরআনে দুই বার উল্লেখ করেছেন,

> ‘হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।’[৫]

সুতরাং সবাই ফিরআউন হয় না। কিন্তু যারা হয়, তাদের সামনে মাথা নোয়াবারও কোনো অর্থ হয় না। কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন,

> ‘আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে, উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদের যারা সঠিকপথে আছে। আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ওই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর করো, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। আপনি সবর করবেন। আপনার সবর কেবলই আল্লাহর জন্য, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে।’[৬]

এখানে তিনটা ধাপ আছে। প্রথমত, তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিশোধ নেয়া এবং সবর করা উভয়ের মাঝে পছন্দ করে নেয়ার অপশন আছে। তৃতীয়ত, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন তাঁর সাহচর্যের মাধ্যমে। অতঃপর আল্লাহ্ শিখিয়ে দিচ্ছেন,

> ‘আপনি বলুন, তবে অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম

---

[৫] সূরা আহক্বাফ, ৪৬ : আয়াত ১৫

[৬] সূরা নাহল, ১৬ : ১২৫-১২৮

> (আল্লাহর ফয়সালার)।’[৭]
>
> এবং ‘বস্তুত আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।’[৮]

সুতরাং, আমার যেসব ভাইবোনরা চারপাশের জালিম লোকজনের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়গুলো আমার কাছে মেলে ধরে তাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার উপায় জানতে চায়, তাদের বলি, পৃথিবীটা পরীক্ষাক্ষেত্র। এই পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হতে চাই সম্মান আর কৃতিত্বের সাথে, হামাগুড়ি দিয়ে নয়। সুতরাং, আমরা জুলুম করব না, কিন্তু জুলুম সহ্যও করব না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করব, অতঃপর ফয়সালা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের এই প্রচেষ্টার উত্তম প্রতিদান দেবেন। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন,

> ‘নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।’[৯]

আমরা কি সেই স্বস্তির আশায় এই সাময়িক কষ্টকে তুচ্ছ ভেবে নিতে পারি না?

---

[৭] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০২

[৮] সূরা ইউনুস, ১০ : ২৯

[৯] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৫

উই লাভ মুহাম্মাদ ﷺ

আমার পাঁচ বছর বয়সী পুত্র কিছুদিন যাবৎ নিজ থেকেই চলতে ফিরতে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। ওর সাথে কথা বলে নিশ্চিত হলাম আল্লাহর সম্পর্কে ওর ধারণা এখন যথেষ্ট স্বচ্ছ। এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবার পর ওকে শেখালাম, ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। এখন চলছে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে জানার পর্ব। তিনি দেখতে কেমন ছিলেন, মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন, কীভাবে চলতেন, কী খেতে ভালোবাসতেন, মানুষের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন, আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল, আমরা তাঁর কাছ থেকে কী শিখব ইত্যাদি। ঠিক এ সময় এক ইয়াহুদীর বানানো চলচ্চিত্র নিয়ে পৃথিবীব্যাপী তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। তখন আমার পুত্র-কন্যার পাশাপাশি আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও জানতে চায় রাসূল ﷺ ছিলেন, কেমন ছিলেন, তাঁর শিক্ষা কী, তাঁর প্রতি আমাদের অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত। ক্ষুদে অনুসন্ধিৎসুদের প্রশ্নের শেষ নেই। তাদের তা-ই বলি যা আল্লাহ বলেছেন,

> ‘তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।’[১০]

প্রথমত, তিনি প্রয়োজন এবং অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুতরাং, তিনি আমাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝতেন। এ জন্যই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত

---

[১০] সূরা তাওবা, ০৯ : ১২৮-১২৯

নির্দেশসমূহ আগে নিজে পালন করতেন যাতে করে তাকে দেখে আমরা উৎসাহিত হতে পারি। খুঁটিনাটি থেকে বৃহৎ—যেমন চুল আঁচড়ানো থেকে হাজ্জের মতো—প্রতিটি কাজ তিনি নিজে উদাহরণ দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন আমরা কীভাবে করব।

তিনি তাঁর সাহাবাদের ভালোবাসতেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই বাবা-মা যেমন অনুগত সন্তানকে কিঞ্চিৎ বেশি ভালোবাসে, তেমনই যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ টান। তাঁর আচরণে এই পার্থক্য ধরা পড়ত না, কেননা মনে মনে তিনি সব সাহাবারই মঙ্গল চাইতেন, সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন, সবাইকে সত্য জানানোর চেষ্টা করতেন। এমনকি তাদের মঙ্গলকামনায় তিনি মাঝে মাঝে এতটাই অধীর হয়ে পড়তেন যে, আল্লাহ রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

> ‘যদি তারা এই বিষয়বস্তুর (কুরআনের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পেছনে পড়ে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।’[১১]

একজন বাবা বা মা যদি দেখেন তাঁদের আদরের সন্তানটি না বুঝে আগুনে হাত দিতে যাচ্ছে, তাহলে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ যিনি তাঁর সাহাবাদেরকে এতটাই ভালোবাসতেন যে নিজে অভুক্ত থেকে তাঁদের খাওয়াতেন, নিজের একটিমাত্র পোশাক থাকলেও বস্ত্রহীন সাথিকে কাপড় দিতেন, নিজের ঘরে খাবার না থাকলেও একটি পয়সা নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন না—তিনি মানুষকে মহানন্দে জাহান্নামের জ্বালানি হবার পথে চলতে দেখলে পাগলপারা হয়ে তাদের রক্ষা করতে চাইবেন, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করে, তারা কতই না অকৃতজ্ঞ। এই হতভাগারা জানেও না যে, রাসূল ﷺ রাতের পর রাত নামাজে দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন তাঁর উম্মাতের মুক্তির জন্য। অথচ তাঁর নিজের আগে-পরের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন!

এর পরে যারা তাঁর আহ্বানে সাড়া না দেয় কিংবা তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে—আল্লাহ তাদেরকে কঠিন আযাবে পাকড়াও করবেন, যেমন তিনি করেছেন পূর্ববর্তী সকল নবি-রাসূলদের কাওমের সাথে। এ প্রসঙ্গে সূরা লাহাবের কথা বলা যায়। এই সূরাটি আমি কখনোই পড়তে পারি না, আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়।

---

[১১] সূরা কাহফ, ১৮ : ৬

এখানে আবু লাহাবের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যে রাসূল ﷺ-কে শারীরিকভাবে কষ্ট দিয়েছিল এবং তার স্ত্রীর শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যে রাসূল ﷺ-কে কথা দিয়ে কষ্ট দিত। কিন্তু এগুলো তো শুধুই উদাহরণ। একই প্রকার শাস্তি কি তাদের জন্যও নির্ধারিত হবে না, যারা পরে একই ধরণের কাজ করবে?

আমার পুত্র-কন্যাদের শুধাই, যে মানুষটি আমাদের এতটা ভালোবেসেছেন যে নিজের আরাম-আয়েশ, মান-সম্মান, দেশ-জাতি, অর্থবিত্ত, পরিবার-পরিজন সবকিছুর বিনিময়ে চেয়েছেন আমাদের সত্যপথের সন্ধান দিতে; আমাদের চিন্তায় অস্থির হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বার বার; সারারাত জেগে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন; সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে আমাদের জন্য অশ্রু, ঘাম আর রক্ত ঝরিয়েছেন অঝোরে সেই রাসূল ﷺ-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা কি বাবা-মার প্রতি ভালোবাসার ঊর্ধ্বে হওয়া উচিত নয়? দারিদ্র্য এবং ক্লেশের কশাঘাত সত্ত্বেও যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো স্থানে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, সর্বাপেক্ষা স্মার্ট, সর্বোচ্চ ভদ্র এবং সুন্দরতম ব্যবহারকারী ব্যক্তি। তাঁর এই আদর্শ তাঁর শত্রুদের বন্ধুতে রূপান্তরিত করত, বিপথগামীকে পথে আনত, আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর মতো অভিশপ্ত দম্পতির কন্যাকে সাহাবি বানাত। [*আসহাবে রাসূল* ﷺ, ৬ষ্ঠ খণ্ড]

আজ অমুসলিমরা তাঁর সম্মানে আঘাত হানছে। তো সত্যিকার অর্থে যারা নিজেদের রাসূল ﷺ-এর অনুসারী বলে দাবি করি, তারা তাঁর সম্মান রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি কি না, এই প্রশ্নটি প্রথমেই চলে আসবে। এরপর যে প্রশ্নটি আসবে তা হলো, আমরা নিজেরা রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করছি কি না? যেকোনো ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসার সর্বোত্তম প্রকাশ হলো তাঁকে অনুসরণ করা। রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে তো বলাই হয়েছে, তিনি আমাদের জন্য 'উসওয়াতুন হাসানাহ' বা 'সর্বোত্তম আদর্শ'। সে ক্ষেত্রে আমরা যদি তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার পরিবর্তে শাহরুখ খান কিংবা অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি, তাতেও কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপমান হয় না? আমরা যদি তাঁর নাম শুনেও 'ﷺ' বলে ছোট্ট একটা দুআ করতে কষ্ট বোধ করি, তাতে কি তাঁর অপমান হয় না? আমরা যদি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশি মতো এর প্রতিবাদ করি, তাতে কি রাসূল ﷺ-এর অপমান হয় না? নিজেরা রাসূল ﷺ-কে পদে পদে অপমান করে আমরা কীভাবে সফল হবো?

তাই আমরা এই নিকৃষ্ট কাজের প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদ করব রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত পথে, পশ্চিমাদের শেখানো পথে নয়। পাশাপাশি আমরা রাসূল ﷺ-এর আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, সে আদর্শকে সবার মাঝে উচ্চকিত করে, পৃথিবীব্যাপী তা ছড়িয়ে দেব।

গত পনেরোই সেপ্টেম্বর ক্যাল্গেরির মুসলিমদের একাংশ ক্যাল্গেরি মিউনিসিপাল বিল্ডিংয়ের সামনে প্রতিবাদসভা করে। ডাউনটাউনের ব্যস্ততম সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে শত শত মুসলিম জানায় তারা এ দেশের জনশক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; রাসূল ﷺ-এর প্রতি এমন ঘৃণ্য আচরণে তারা ক্ষুব্ধ। তারা জীবন থাকতে তাদের রাসূল ﷺ-কে অপমানিত হতে দেবে না। সমাবেশ শেষে সবাই ক্যাল্গেরি মিউনিসিপাল বিল্ডিংয়ের সামনে একত্রে নামায আদায় করে। সবচেয়ে আদর লাগে একটি ছোট্ট শিশুকে, যে তার বুকে লিখেছিল ‘I love Muhammad ﷺ, My name is Muhammad’. ছেলেটির বয়স বড়জোর সাড়ে তিন-চার হবে। ইন শা আল্লাহ সেদিনের প্রোগ্রামে উপস্থিত প্রতিটি শিশুই মনে রাখবে—আমরা রাসূল ﷺ-এর অনুসারী। আমরা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর গর্বিত উম্মাত। আর এই উম্মাহ তাদের নবি ﷺ-এর সম্মান রক্ষায় যেকোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। প্রয়োজন হলে নিজেদের জীবনকেও বাজি রাখতে প্রস্তুস্ত।

আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে ওয়াদা করেছেন, ‘আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।’[১২] সুতরাং, যে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিয়ামাত পর্যন্ত প্রতিবার আযানে তাঁর নাম সম্মানের সাথে উচ্চারিত হতে থাকবে, কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষ তাঁকে নিজের পিতামাতার চেয়ে বেশি ভালোবাসবে, কিয়ামাত পর্যন্ত মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে সালাম পৌঁছতে থাকবে। দু-একটা মশা সামান্য ওড়াওড়ি করবে, কিন্তু মশার জীবনের দৈর্ঘ্য কয়েকটি দিন মাত্র। আল্লাহর ওয়াদা সত্য,

> ‘নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।’[১৩]

সেই স্বস্তি সেদিন আসবে, যেদিন আমরা কেবল মুখে না বলে কাজে প্রমাণ করতে পারব, আমরা রাসূল ﷺ-কে কতটা ভালোবাসি।

---

[১২] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৪

[১৩] সূরা ইনশিরাহ, ৯৪ : ৫-৬

আযান

পৃথিবীতে আগমনের পর পর স্বাগতম জানাতে মুসলিম শিশুর কানে যে আযান দেয়া হয়, তারপর থেকে কত লক্ষ বার যে আযানের ধ্বনি তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তা আমরা হিসেব করে দেখি না কখনো। আযানের শব্দে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে যাই যে, এর কথাগুলো আমাদের কাছে আর দশটা শব্দ থেকে আলাদা করে ধরা পড়ে না। আযানে কী বলা হচ্ছে তা আমরা ভেবেও দেখি না। অথচ এই আযানের প্রতিটি শব্দ যে কত অর্থপূর্ণ, কত গুরুত্ববহ! আমরা যদি মহান আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য স্বীকার করে নিই, নামাজের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচ বার তাঁর কাছে জবাবদিহিতার তাগাদা অনুভব করি—আমরা কাউকে ভয় করব না সঠিক কাজটি করার ব্যাপারে, চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখব না অন্যায় থেকে দূরে থাকার জন্য। মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিলে আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথের ওপর অবস্থান করার চেষ্টা করব সদাসর্বদা। এই পথ ধরেই আমাদের জীবনে আসবে পরম সাফল্য। ভোরবেলা নরম বিছানা ছেড়ে উঠে শুরু হবে প্রবৃত্তির দমন, তাহলে দিনব্যাপী আর কোনো প্রবৃত্তি কি আমাদের কাবু করতে পারবে?

আযানের পেছনে যে কাহিনি তা তো আরও চমকপ্রদ! আমরা অনেকেই জানি, বিলাল رضي الله عنه যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি উমাইয়া ইবন খালফের ক্রীতদাস। উমাইয়া ছিল ইসলামের প্রধানতম শত্রুদের একজন। সে ইসলামকে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় রত আর তারই ঘরে কিনা ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করে বসে আছে! সে প্রথমে বিলাল رضي الله عنه কে নানান প্রলোভন দিয়ে ইসলাম হতে বিরত রাখার চেষ্টা করে। বিলাল رضي الله عنه এর এককথা, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। ব্যর্থতার জ্বালা সইতে না পেরে উমাইয়া বিলাল رضي الله عنه কে নানাভাবে নির্যাতন করতে শুরু করে। নির্যাতনের একপর্যায়ে বিলাল رضي الله عنه কে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপর